ISSN 1605-2021

লোকপ্রশাসন সাময়িকী
সপ্তদশ সংখ্যা, ডিসেম্বর ২০০০, পৌষ ১৪০৭

ক্ষুদ্র রাষ্ট্রের নিরাপত্তা ও বাংলাদেশঃ একটি পর্যালোচনা

মেহেদী মাসুদ *

Security of small states and Bangladesh : A critical review. Mehedi Masud

Abstract: Security is a precondition to development. There can be no human progress without the essence of security-without a secure society. In global politics, national security is central to all sovereign states. Hence, states regularly assess the threat perception and keep vigil on the security arrangements. But this sort of perception can not be wholly applied to the small states of the third world. The third world states are always preoccupied with their own internal problems like fulfilling the fundamental needs. External security is of secondary importance to them. Domestic security is more important to them as sometimes external threats crop up because of mishandling of the domestic ones. The tribal insurgency problem of Bangladesh may be cited as one of the examples. The Indian connection of tribal issue gave it international looks. The issue is now settled with the signing of CHT peace treaty. Therefore we see the notion of security is different in the third world countries. This paper examines the threat perception of Bangladesh, its geostrategic setting, and prescribes for its security arrangement. It also explains the definition of security in the context of the small states.

নিরাপত্তার ধারণাটি মানবেতিহাসের মতোই সুপ্রাচীন। কেননা এটির সাথে অস্তিত্বের প্রশ্নটি জড়িত। নিরাপদে থাকার নামই নিরাপত্তা। আন্তর্জাতিক অঙ্গনে নিরাপত্তা বিষয়ক ধ্যান ধারণাসমূহ দ্বিতীয় বিশ্ব যুদ্ধোত্তর কাল থেকেই ব্যাপক

---

* মূল্যায়ন কর্মকর্তা, বিপিএটিসি, সাভার, ঢাকা।

পরিসরে আলোচিত হতে থাকে। সাধারণভাবে নিরাপত্তা বলতে আমরা সামরিক নিরাপত্তা বুঝে থাকি। এটি আংশিক সত্য। নিরাপত্তার একটি গ্রহণযোগ্য সংজ্ঞা এই প্রবন্ধের পরবর্তী অংশে প্রদান করার চেষ্টা করা হয়েছে। কেননা সামরিক নিরাপত্তা হলো নিরাপত্তার একটি অংশ মাত্র। এর অন্যান্য অবিচ্ছেদ্য অংশগুলো কোন ক্রমেই গুরুত্বহীন নয়। বরং কোন কোন ক্ষেত্রে অপরিহার্য। উদাহরণ স্বরূপ বলা যায়, অর্থনৈতিক নিরাপত্তা স্নায়ুযুদ্ধোত্তর বিশ্বে নিরাপত্তার ভিত্তি হিসেবে বিবেচিত হচ্ছে। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের সাবেক প্রতিরক্ষা সচিব রবার্ট এস, ম্যাকনামারা যথার্থই বলেন "It is increasingly being realised that it is poverty, not the lack of military hardware that is responsible for inscurity across the southern half of the planet" (Mc Namara, 1968 : 149)। অর্থাৎ দারিদ্র্যই হল বিশ্বের দক্ষিণ গোলার্ধের নিরাপত্তাহীনতার কারণ। নিরাপত্তার সামাজিক ও অর্থনৈতিক উপাদানসমূহ বর্তমানে অধিকতর গুরুত্ব বহন করে। ধনী দরিদ্রের বৈষম্য, জাতিগত দাঙ্গা-বিরোধ, কুসংস্কার, অশিক্ষা প্রভৃতি রাষ্ট্রসমূহের প্রতি গুরুতর হুমকির কারণ হয়ে দাঁড়িয়েছে।

বর্তমান প্রবন্ধের মূল উদ্দেশ্য হচ্ছে– (১) নিরাপত্তা ও ক্ষুদ্রতা সম্বন্ধে প্রাথমিক ধারণা প্রদান ও (২) নিরাপত্তার নিরিখে তৃতীয় বিশ্বের একটি ক্ষুদ্র রাষ্ট্র হিসেবে বাংলাদেশের অবস্থান, ঝুঁকি ও করণীয়সমূহ সম্বন্ধে আলোকপাত করা।

ক্ষুদ্রতা ও নিরাপত্তা

সাম্প্রতিক বছরগুলিতে বিশেষ করে ভারত ও পাকিস্তান কর্তৃক ১৯৯৮ সনের মে মাসে আণবিক বোমা বিস্ফোরণের পর থেকে উপমহাদেশে সামরিক নিরাপত্তার বিষয়টি নিয়ে বিশেষজ্ঞগণ নতুন চিন্তা ভাবনা শুরু করেছে। তাই ক্ষুদ্র রাষ্ট্র ও নিরাপত্তা–এই দুটো প্রত্যয় সম্বন্ধে আলোকপাত করা দরকার। প্রথমেই ক্ষুদ্র রাষ্ট্র প্রসঙ্গে আসা যাক। ডেভিড, জে, সিঙ্গার এবং মেলভিন স্মল (১৯৭৩) মনে করেন, প্রতিটি রাষ্ট্রের রাজধানীতে অবস্থানরত কূটনীতিকদের সংখ্যা এবং তাঁদের শ্রেণীনিরূপিত আন্তর্জাতিক মর্যাদার শ্রেণীবিন্যাস অর্থাৎ Interna-

tional Status Ordering এর মাধ্যমে বৃহৎ ও ক্ষুদ্র রাষ্ট্রের পার্থক্য নিরূপণ করা যায়। প্রকৃতপক্ষে রাষ্ট্রসমূহের বৈদেশিক নীতি প্রণয়ন ও বাহ্যিক আচরণ বিশ্লেষণ দ্বারাই বৃহৎ রাষ্ট্র ও ক্ষুদ্র রাষ্ট্রের তারতম্য নির্ণয় করা যায়। কেননা রাষ্ট্রসমূহের বৈদেশিক সম্পর্ক ও আচরণ অবশ্যম্ভাবীরূপে অর্থনৈতিক, সামরিক, রাজনৈতিক ও জাতীয় স্বার্থের উপর নির্ভরশীল। অর্থাৎ জাতীয় শক্তির (National Power) উপর বহুলাংশে নির্ভর করে থাকে রাষ্ট্রসমূহের বাহ্যিক আচরণ ও সম্পর্ক। ইতিহাস ঘাঁটলে দেখা যায় যে ক্ষুদ্র রাষ্ট্র/ক্ষুদ্র শক্তি এবং বৃহৎ রাষ্ট্র/বৃহ শক্তির মধ্যে পৃথকীকরণের প্রয়োজনীয়তা অনুভূত হয়েছিল সর্বপ্রথম সামরিক প্রয়োজনের তাৎক্ষণিক প্রতিক্রিয়া হিসেবে। এই বিভাজন রেখা অংকিত হয় নেপোলিয়নীয় যুদ্ধের পর ভিয়েনা কংগ্রেসে। ১৮১৪ সনে সম্পাদিত Chaumant চুক্তি অনুযায়ী পুনরায় ফরাসী আক্রমণের আশংকায় বিভিন্ন জাতি গোষ্ঠীর উপর পরবর্তী বিশ বছর ৬০,০০০ (ষাট হাজার) সৈন্য রাখার বাধ্যবাধকতা আরোপ করা হয়েছিল। যে সমস্ত রাষ্ট্র এই বাধ্যবাধকতা গ্রহণ করেছিল অর্থাৎ গ্রহণের সামর্থ্য ছিল সেগুলি বৃহৎ শক্তি/বৃহৎ রাষ্ট্র এবং বাদবাকী সব ক্ষুদ্র রাষ্ট্র রূপে চিহ্নিত হয় (Rothstein, 1968)। আধুনিক সমরবিশেষজ্ঞগণের মতে জি এন পি ও সামরিক বাজেটের মাধ্যমেই রাষ্ট্রসমূহের শক্তিমত্তা বা বড়ত্ব ও ক্ষুদ্রত্ব নির্ধারণ করা যায়। অবশ্য ক্ষুদ্র শব্দটি আপেক্ষিক। উদাহরণস্বরূপ বলা যায় যে, দক্ষিণ এশিয়ার প্রেক্ষাপটে পাকিস্তান একটি বৃহৎ শক্তি কিন্তু বৈশ্বিক প্রেক্ষাপটে অর্থাৎ আমেরিকা, রাশিয়া ও চীনের তুলনায় পাকিস্তান একটি ক্ষুদ্র শক্তি। তাহলে বলা যায় যে ক্ষুদ্র রাষ্ট্র বলতে আমরা সেই সব রাষ্ট্রকে বুঝি যার জিএনপি ও সামরিক বাজেট আঞ্চলিক ও বৈশ্বিক এই উভয়বিদ প্রেক্ষাপটেই ক্ষুদ্র। প্রখ্যাত রাষ্ট্রবিজ্ঞানী অধ্যাপক তালুকদার মনিরুজ্জামান জিএনপি ও সামরিক বাজেট এ দুটো সংখ্যাগত নির্ণায়কের ভিত্তিতে জাতিসমূহের সামগ্রিক শক্তি সূচক অবস্থান নির্ণয় করেছেন। এই নির্ণায়ের ভিত্তিতে নিম্নে ১১টি রাষ্ট্রের মর্যাদাক্রম প্রদত্ত হলঃ

সারণী ১। পরিমাণগত সমর সক্ষমতা অনুযায়ী ১১টি রাষ্ট্রের মর্যাদাক্রম

দেশের নাম	১৯৯৮ সনের মুদ্রামান হিসেবে জি এন পি মার্কিন ডলার (বিলিয়ন)	জি এন পির জন্য স্কোর	** ১৯৯৮ সনের মুদ্রামান হিসেবে সামরিক বাজেট	সামরিক বাজেটের * জন্য স্কোর	মোট	র‍্যাংক
মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র	৭৯০৩.০	১০০.০০	২৬৩.৩৭ বি	৫০.০০	১৫০.০০	১
জাপান	৪০৮৯.১	৫১.৭৪	৩৭.৮৩ বি	৭.১৮	৫৮.৯২	২
জার্মানী	২১৭৯.৮	২৭.৫৮	৩২.০১ বি	৬.০৭	৩৩.৬৫	৩
ফ্রান্স	১৪৬৫.৪	১৮.৫৪	৩৯.৯৫ বি	৭.৫৮	২৬.১২	৪
যুক্তরাজ্য	১২৬৪.৩	১৫.৯৯	৩৬.৬৪ বি	৬.৯৫	২২.৯৪	৫
ইটালী	১১৫৭.০	১৪.৬৪	২৩.৪৩ বি	৪.৪৪	১৯.০৮	৬
চীন	৯২৩.৬	১১.৬৮	১৮.২২ বি	৩.৪৫	১৫.১৩	৭
ব্রাজিল	৭৬৭.৬	৯.৭১	১০.৮৯ বি	২.০৬	১১.৭৭	৮
কানাডা	৫৮০.৯	৭.৩৫	৭.৫৪ বি	১.৪৩	৮.৭৮	৯
ভারত	৪২৭.৪	৫.৪০	৯.৩ বি	১.৭৬	৭.১৬	১০
রুশ ফেডারেশন	৩৩১.৮	৪.১৯	৮.৮৫ বি	১.৬৮	৫.৮৭	১১

সূত্র ঃ মানব উন্নয়ন প্রতিবেদন। ইউ, এন, ডি, পি, ২০০০।

* অধ্যাপক তালুকদার মনিরুজ্জামান অনুসৃত পদ্ধতি অবলম্বনে। বিস্তারিত পাঠের জন্য দেখুন, তৃতীয় বিশ্বের ক্ষুদ্র রাষ্ট্রের নিরাপত্তা, অধ্যাপক তালুকদার মানিরুজ্জামান পৃঃ ১৩- ১৪।

** সামরিক বাজেটটি জিডিপির শতাংশ হিসেবে মানব উন্নয়ন প্রতিবেদন ইউ, এন, ডি, পি, ২০০০-এ প্রদত্ত আছে। সেখানে থেকে গণনা করে সামরিক বাজেট নির্ণয় করা হয়েছে।

এবারে আসা যাক নিরাপত্তা প্রসঙ্গে। নিরাপত্তার ধারণা ব্যাখ্যা করতে গিয়ে ওয়াল্টার লিপম্যান বলেন, "A nation is secure to the extent to which it is not in danger of having to sacrifice core values, if it wished to avoid war and is able, if challenged, to maintain them by such victory in such a war" (Lippman, 1943 : 51) । অর্থাৎ একটি জাতি ততক্ষণ পর্যন্ত নিরাপদ যতক্ষণ পর্যন্ত তাঁর মৌলিক মূল্যবোধগুলো বিসর্জন দেবার মতো অবস্থায় পতিত না হয় এবং চ্যালেঞ্জ মোকাবেলার মাধ্যমে নিজেকে রক্ষা করতে সমর্থ হয়।

তৃতীয় বিশ্বের প্রখ্যাত বিশেষজ্ঞ অধ্যাপক তালুকদার মনিরুজ্জামানের মতে "নিরাপত্তা দ্বারা আমরা যে কোন জাতির রাজনৈতিক স্বাধীনতা ও ভৌগোলিক অখন্ডতার মত ন্যূনতম মৌলিক মূল্যবোধগুলো প্রতিরক্ষা ও সংরক্ষণ করাকে বুঝে থাকি" (Maniruzzman, 1982)। সুতরাং একথা আমরা নির্দ্বিধায় বলতে পারি যে, নিরাপত্তা বলতে শুধু সামরিক নিরাপত্তা বা বৈদেশিক আগ্রাসন থেকে রক্ষা পাবার সামর্থ্যকেই বুঝায় না বরং এটা বহুলাংশে অ-সামরিক উপাদানের উপর নির্ভরশীল। বাস্তবিকপক্ষে সংকীর্ণ সামরিক প্রিজম (Prism) এর ভেতর দিয়ে নিরাপত্তার রূপ ও দর্শন অনুধাবন করা সম্ভব নয়। নিরাপত্তা দ্বারা অ-সামরিক ও অপ্রচলিত/অসনাতন হুমকি থেকে আত্মরক্ষার সামর্থ্যকেও বুঝানো হয়ে থাকে। আন্তর্জাতিক সন্ত্রাসবাদ, মাদক চোরাচালান, জাতিগত বিরোধ, পরিবেশ দূষণ, প্রাকৃতিক দুর্যোগ, দারিদ্র প্রভৃতি নিরাপত্তার সনাতন ধারণাটিকে আমূলভাবে রূপান্তরিত করেছে। সুতরাং দেখা যায় যে, নিরাপত্তার সামরিক অংশটির গুরুত্ব স্নায়ুযুদ্ধোত্তরকালে অনেকাংশে হ্রাস পেয়েছে। রবার্ট এস, ম্যাকনামরা এই প্রসঙ্গে যথার্থ মন্তব্য করেন, "Security means development. Security is not military hardware though it may include it, security is not military force though it may involve it, security is not traditional military activity, though it may encompass it, security is development and without development there can be no security" (Maniruzzaman, 1982 : 149) । একটি রাষ্ট্রের জাতীয় নিরাপত্তা নীতি রাষ্ট্রের ভৌগোলিক অখন্ডতা রক্ষা

ছাড়াও রাষ্ট্রটির জন্য এমন একটি ব্যবস্থা গ্রহণ করে থাকে যার মাধ্যমে একটি প্রগতিশীল ও গণতান্ত্রিক সমাজ গড়ে উঠে। কেননা অভ্যন্তরীণ গোলযোগ ও অস্থিতিশীলতা প্রায়শঃই বহিঃশত্রু কর্তৃক সৃষ্ট হুমকির চেয়ে বড় হুমকি হয়ে দাঁড়ায়। কাজেই জাতীয় নিরাপত্তা নীতি হল একটি রাষ্ট্রের প্রতিরক্ষা ও সামাজিক চাহিদার সুষম সমন্বয়। সুশাসনের অনুপস্থিতি, দুর্বল প্রশাসনিক কাঠামো, দুর্নীতি, রাজনৈতিক অস্থিতিশীলতা, ক্ষুধা, দারিদ্র্য প্রভৃতি তৃতীয় বিশ্বের দেশগুলোর একটি সাধারণ চিত্র। সুতরাং তৃতীয় বিশ্বের দেশসমূহে নিরাপত্তার অভ্যন্তরীণ হুমকি তুলনামূলকভাবে বেশী স্পষ্ট- বিশেষতঃ বর্তমান বহুমেরুকেন্দ্রিক বিশ্ব ব্যবস্থায়। এটা হাতাশাজনক যে, অনুন্নত দেশসমূহ বেশীরভাগ ক্ষেত্রেই এই অভ্যন্তরীণ হুমকি মোকাবেলার জন্য সামরিক চাহিদার শরণাপন্ন হয়। সামরিকশক্তির আশীর্বাদ পুষ্ট হয়ে এই সব তৃতীয় বিশ্বের রাষ্টনায়কগণ ক্ষমতার ভিত পাকাপোক্ত করায় অভিলাষী হয়ে উঠেন। নিম্নের সারণীটি এই ধারণাটিকে আরো স্পষ্ট করবে।

সারণী ২। প্রতিরক্ষা বাজেট

দেশ	প্রতিরক্ষা বাজেট			জিডিপিতে প্রতিরক্ষা বাজেটের শতকরা অংশ		
	১৯৮৫	১৯৯৬	১৯৯৭	১৯৮৫	১৯৯৬	১৯৯৭
যুক্তরাজ্য	$ ৪৫.৪ বি	$ ৩৫.২৬বি	$ ৩৫.৭৪বি	৫.২	৩.০	২.৮
ফ্রান্স	$ ৪৬.৫ বি	$ ৪৭.৪ বি	$ ৪১.৫ বি	৪.০	৩.৩	৩.০
কানাডা	$ ১১.১৪ বি	$ ৮.৬ বি	$ ৭.৭৫ বি	২.২	১.৪	১.৩
ভারত	$ ৮.৯ বি	$ ১২.০৭ বি	$ ১২.৮ বি	৩.০	৩.৩	৩.৩
পাকিস্তান	$ ২.৯৫ বি	$ ৩.৬৫ বি	$ ৩.৫০ বি	৬.৯	৫.৯	৫.৮
শ্রীলংকা	$ ৩.২৫ মি	$ ৮.৮৭ মি	$ ৮.৯৮ মি	৩.৮	৬.৩	৬.১
বাংলাদেশ	$ ৩৩৬ মি	$ ৫৫৪ মি	$ ৫৯৩ মি	১.৪	১.৭	১.৯

উৎস ঃ দি মিলিটারি ব্যালেন্স ১৯৯৮/৯৯, দি ইন্টারন্যাশনাল ইনষ্টিটিউট ফর ষ্ট্র্যাটেজিক ষ্টাডিজ। লন্ডন,১৯৯৮।

বাংলাদেশের নিরাপত্তা ভাবনা ও ভূ-রাজনৈতিক পরিবেশ ঃ

বাংলাদেশের নিরাপত্তার ঝুঁকির দুইটি উৎস– বৈদেশিক ও আভ্যন্তরীণ। পূর্বের আলোচনার রেশ ধরে বলা যায় ক্ষুদ্রতা ও নিরাপত্তার প্রেক্ষাপটে আমাদের নিরাপত্তা ইস্যুসমূহ প্রধানত আন্তঃসম্পর্কিত। এই কারণে এই নিরাপত্তা ইস্যুসমূহকে নিয়মিতভাবে চিহ্নিত করা, বিশ্লেষণ ও বস্তুগতভাবে সংজ্ঞায়নের মাধ্যমে হাল নাগাদের ব্যবস্থা করতে হবে। কেননা আন্তর্জাতিক রাজনীতিতে চিরস্থায়ী শত্রু বা চিরস্থায়ী মিত্র বলে কোন কথা নেই। কাজেই রাষ্ট্রসমূহের পারস্পরিক বিনিময়, ঘাত-প্রতিঘাত, কূটনৈতিক সম্পর্কের পরিবর্তন, অভ্যন্তরীণ রাজনৈতিক মেরুকরণ প্রভৃতির ভিত্তিতে নিরাপত্তা ইস্যুসমূহেরও পরিবর্তন ঘটে। বাংলাদেশও এর ব্যতিক্রম নয়। বাংলাদেশের নিরাপত্তা মূলত ভারত-কেন্দ্রিক। এটাই সনাতন দৃষ্টিভঙ্গী। সত্যও বটে। ভৌগলিকভাবে বাংলাদেশ হল ভারত বেষ্টিত একটি দেশ। তিন দিকেই রয়েছে ভারতীয় ভূ-খন্ড। দক্ষিণে রয়েছে বঙ্গোপসাগর। আর দক্ষিণ-পূর্বে অবস্থিত মায়ানমার হলো ভারত ব্যতীত দ্বিতীয় রাষ্ট্র যার সাথে বাংলাদেশের 'Common Border' রয়েছে এবং এর দৈর্ঘ্য মাত্র ২৮০ কিঃ মিঃ। পক্ষান্তরে ভারতরে সাথে বাংলাদেশের সীমান্ত দৈর্ঘ্য হল ৩৭১৫ কিঃ মিঃ। কার্যতঃ ভারতই হল বাংলাদেশের একমাত্র প্রতিবেশী। বাংলাদেশ একটি বিচ্ছিন্ন রাষ্ট্রে পরিণত হবে যদি কোন কারণে শক্তিশালী ভারতীয় নৌবাহিনী (যার কোন জুড়ি এই অঞ্চলে নেই) বঙ্গোপসাগরে বাংলাদেশের সরাসরি সংযোগস্থলে অবরোধ স্থাপন করে। পারিভাষিকভাবে এই ধরণের পরিস্থিতিকে "Tyranny of Geography" বলে অভিহিত করা হয়। ভারত-নির্ভরশীলতা সৃষ্টির কারণ বহুবিধ। প্রথমতঃ বাংলাদেশ একটি নদী বহুল দেশ। এই ব-দ্বীপের চুয়ান্নটি (৫৪) নদীর সবগুলিরই উৎপত্তিস্থল বা উৎস হল ভারতের উত্তর-পূর্বাঞ্চলের হিমালয় পর্বতমালা। উজানের দেশ হিসেবে স্বভাবতঃই ভারত সুবিধাজনক অবস্থানে রয়েছে। বাংলাদেশের ৯২% পানি প্রবাহিত হয় ভারতে হতে। সুতরাং পানি সম্পদ ব্যবস্থাপনার জন্য বাংলাদেশকে নির্ভর করতে হয় ভারতের করুণার উপর। এর ফলে সময়ে-অসময়ে অনাবৃষ্টি/খরা, অতিবৃষ্টি/বন্যা প্রভৃতি প্রাকৃতিক দুর্যোগের সম্মুখীন হতে হয় বাংলাদেশকে। গঙ্গা পানি চুক্তি, ১৯৯৬ এর ফলে পরিস্থিতির কিছুটা উন্নতি হয়েছে বলে

বিশেষজ্ঞরা মনে করেন। দ্বিতীয়তঃ পার্বত্য চট্টগ্রামে উপজাতীয় বিচ্ছিন্নতাবাদ আন্দোলনে বহুদিন ভারত ইন্ধন যুগিয়েছে বলে ধারণা করা হয়। কেননা বাংলাদেশের অতীত সরকারগুলো ছিল ভারত বিরোধী। সেই সময় সরকারের চীন ও পাকিস্তানপন্থী নীতির পাল্টা ব্যবস্থা হিসেবেই ভারত পার্বত্য চট্টগ্রামে বিচ্ছিন্নতাবাদ আন্দোলন জিইয়ে রেখেছিল। বর্তমান সরকারের আমলে পার্বত্য চট্টগ্রাম শান্তিচুক্তি, ১৯৯৭ স্বাক্ষরিত হওয়ায় ভারত ও বাংলাদেশের মধ্যে বন্ধুত্বপূর্ণ সম্পর্ক বিরাজ করছে। তৃতীয়তঃ ভারত-বেষ্টিত হওয়ার কারণে স্থল যোগাযোগের জন্য বাংলাদেশ ভারতের উপর সামগ্রিকভাবে নির্ভরশীল।

বাংলাদেশের অপর প্রতিবেশী মায়ানমারে বর্তমানে সামরিক সরকার ক্ষমতাসীন। ইতোমধ্যেই রোহিঙ্গা শরণার্থী ইস্যু নিয়ে মায়ানমারের দীর্ঘসূত্রতা অবলম্বন বাংলাদেশে অসন্তোষ সৃষ্টি করেছে। এছাড়া উভয় দেশের মধ্যকার অর্থনৈতিক সমুদ্র সীমা এখনও সঠিকরূপে চিহ্নিত না হওয়ায় সমস্যা বিরাজ করছে।

বাংলাদেশের ভূ-কৌশলগত অবস্থান কিছু সুনির্দিষ্ট কারণে গুরুত্বপূর্ণ। প্রথমতঃ বাংলাদেশ তার ভৌগোলিক অবস্থানের কারণে উত্তর পূর্বাঞ্চলীয় সাতটি ভারতীয় রাজ্যকে (সেভেন সিষ্টারস নামে পরিচিত) অবশিষ্ট ভারত থেকে পৃথক করে রেখেছে। উল্লেখ্য এই সেভেন সিষ্টারস যা North-East Frontier Agency নামেও পরিচিত, একটি রাজনৈতিক বিচ্ছিন্নতাবাদ আন্দোলন কবলিত এলাকা। ভারত সকারের নিরবচ্ছিন্ন উদ্যোগ সত্ত্বেও এই অঞ্চলে গোলযোগ অব্যাহত রয়েছে। এই কারণেই ভারত সব সময় একটি বন্ধুভাবাপন্ন বাংলাদেশকে পাশে চাইবে। ১৯৭১ সনে বাংলাদেশের স্বাধীনতা যুদ্ধে ভারতের প্রত্যক্ষ সামরিক সহায়তার এটাও একটি অন্যতম কারণ।

দ্বিতীয়তঃ বাংলাদেশ থেকে চীনের দুরত্ব মাত্র ৯৩ কিঃ মিঃ। একটি বৃহৎ শক্তি হিসেবে চীনের এই অঞ্চলে প্রত্যক্ষ স্বার্থ রয়েছে। সন্দেহ করা হয়, ভারতের উত্তর-পূর্বাঞ্চলীয় রাজ্য সেভেন সিষ্টারস-এ চীনের উসকানীতেই গোলযোগ অব্যাহত রয়েছে। যদিও একসময় অভিযোগ ছিল যে বাংলাদেশের মদদ রয়েছে বিদ্রোহীদের পিছনে।

তৃতীয়তঃ বাংলাদেশ পশ্চিম এশিয়াকে দক্ষিণ পূর্ব এশিয়ার সাথে সংযুক্ত করেছে। অর্থাৎ এই দুই অংশের মধ্যে Geographic Bridge রূপে বাংলাদেশ বিরাজ করছে। এবং চতুর্থতঃ ভারত মহাসাগরে বাংলাদেশের সংযোগ রয়েছে বঙ্গোপসাগরের মাধ্যমে।

ভৌগোলিকভাবে বাংলাদেশের প্রতিরক্ষা ব্যবস্থা কিছুটা প্রতিবন্ধকতার সম্মুখীন। বাংলাদেশের ভূ-প্রকৃতি প্রতিরক্ষা কৌশলকে দুর্বলতর করেছে। বিশাল জলরাশি বা উঁচু পর্বতশ্রেণীর মত কোন প্রাকৃতিক প্রতিবন্ধক বাংলাদেশে নেই। ফলে যে কোন বৈদেশিক আক্রমণে বাংলাদেশ সহজেই শোচনীয় অবস্থায় পতিত হতে পারে। এছাড়া বাংলাদেশ একটি ক্ষুদ্র রাষ্ট্র বিধায় কোন ভূ-খন্ডগত গভীরতা/বিস্তার (Territoral depth) এর নেই। ফলে প্রলম্বিত যুদ্ধবিগ্রহে (Protracted Warfare) বাংলাদেশের টিকে থাকার সম্ভাবনা কম। প্রাক্তন সোভিয়েত ইউনিয়ন একটি বিশাল রাষ্ট্র ছিল। এই কারণে দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধে নাৎসী বাহিনীর কাছে প্রাথমিক বিপর্যয়ের পরেও শেষ পর্যন্ত নাৎসী বাহিনী সোভিয়েট ইউনিয়নের কাছে হার মানে। জার্মান বাহিনী রাশিয়ার বিস্তীর্ণ ভূ-খন্ড জয় করার পরেও যখন দেখে সামনে আরো বিস্তৃত রাশিয়া, রাজধানী মস্কো অনেক দূরে, আর বিখ্যাত রুশ শীতকাল জেঁকে বসেছে তখন অনাহারে যুদ্ধক্লান্ত, শীতক্লিষ্ট জার্মান বাহিনী অনবরত তুষারপাতে বিধ্বস্ত হয়ে পড়ে। তাঁদের মনোবল ভেঙ্গে পড়ে। অবশেষে নাৎসী বাহিনী আত্মসমর্পনে বাধ্য হয়। সুতরাং এটা সহজেই অনুমেয় যে ভূ-খন্ডগত গভীরতা একটি বড় উপাদান সামরিক ক্ষেত্রে।

বাংলাদেশের নিরাপত্তার প্রতি হুমকিসমূহ

পূর্বেই বলা হয়েছে তৃতীয় বিশ্বের অন্যান্য দেশের মত বাংলাদেশের নিরাপত্তার ক্ষেত্রে হুমকি মূলত দুই প্রকারঃ অভ্যন্তরীণ হুমকি ও বৈদেশিক হুমকি।

ক) অভ্যন্তরীণ হুমকিসমূহ

বাংলাদেশের অভ্যন্তরীণ হুমকির প্রধানত তিনটি উৎস রয়েছেঃ আর্থ-সামাজিক, রাজনৈতিক ও পরিবেশগত। এছাড়া প্রাকৃতিক দুর্যোগ যথাঃ বন্যা, অতিবৃষ্টি/অনাবৃষ্টি, সামুদ্রিক জলোচ্ছ্বাস, পাহাড়ী ঢল এবং অশিক্ষা, বৈদেশিক সাহায্যের

উপর নির্ভরশীলতা, মৌলবাদ ও জাতি বিরোধ প্রভৃতি আমাদের জাতীয় নিরাপত্তার প্রতি হুমকি সৃষ্টি করেছে। এগুলো পর্যায়ক্রমিকভাবে আলোচনা করা হলঃ

(১) আর্থ সামাজিক হুমকি

মানব উন্নয়ন প্রতিবেদন, ইউ. এন. ডি. পি (UNDP) এর প্রতিবেদন, ২০০০ অনুযায়ী বিশ্বে মানব উন্নয়নসূচকে বাংলাদেশের স্থান ১৪৬তম এবং বাংলাদেশের মাথাপিছু আয় মাত্র ৩৫০ ইউ. এস. ডলার। বাংলাদেশের আয়তন মাত্র ১,৪৭,৫৭০ বর্গ কিলোমিটার। জনসংখ্যা ১২ কোটি ৭০ লক্ষ। জনসংখ্যা বৃদ্ধির হারে পরিবর্তন না ঘটলে আগামী ২০২৫ সন নাগাদ বাংলাদেশের জনসংখ্যা বেড়ে প্রায় দ্বিগুণ হবে। কাজেই আমাদের জনসংখ্যার চিত্র অত্যন্ত ভয়াবহ। দেশের দরিদ্র অর্থনীতির জন্য এই বিপুল জনসংখ্যা এক অস্বাভাবিক পরিস্থিতি সৃষ্টি করেছে। দারিদ্র্য পীড়িত জনগণ কখনোই দেশের নিরাপত্তা ব্যবস্থায় আশানুরূপ অবদান রাখতে পারে না। বরং দারিদ্র্য দেশের নিরাপত্তার জন্য হুমকি স্বরূপ। ভঙ্গুর অর্থনীতি রাজনৈতিক অস্থিতিশীলতা, দুর্নীতি, সামাজিক বিশৃঙ্খলা ও অরাজকতা সৃষ্টি করে। প্রতিবেশী রাষ্ট্র এই অরাজতকার সুযোগ গ্রহণ করে এবং তাঁদের কায়েমী স্বার্থ চাপিয়ে দেয়। দেশের স্বাধীনতা হয়ে পড়ে বিপন্ন। এই প্রসঙ্গে শ্রীলংকার তামিল সমস্যাকে আমরা উদাহরণ হিসেবে উল্লেখ করতে পারি। শ্রীলংকার তামিল বিচ্ছিন্নতাবাদী আন্দোলনকে বর্তমান পর্যায়ে আনার কৃতিত্ব কিছুটা হলেও প্রতিবেশী সরকারকে স্বীকার করতে হবে।

সামাজিক অবক্ষয় ক্রমান্বয়ে বাড়ছে। শিক্ষিত বেকার যুবগোষ্ঠী বিপথগামী হয়ে পড়ছে অভাবের তাড়নায়। এরা সহজেই বিদেশী সেবাদাসদের ক্রীড়ণকে পরিণত হতে পারে। অর্থের বিনিময়ে অন্তর্ঘাতমূলক কাজ করা এদের পক্ষে বিচিত্র কিছু নয়।

(২) রাজনৈতিক অস্থিতিশীলতাজনিক হুমকি

স্বাধীনতার গৌরবোজ্জ্বল ইতিহাস নিয়ে ১৯৭১ সনে বাংলাদেশের সূচনা লগ্ন অত্যন্ত সম্ভাবনাময় ছিল। কিন্তু স্বাধীনতার চার বছরের মধ্যে দেশটি জটিল

রাজনৈতিক ঘূর্ণাবর্তে পতিত হয়। ঘন-ঘন ক্ষমতা বদল, সামরিক সরকারের দমন-পীড়ন প্রভৃতি পেরিয়ে বাংলাদেশে এখন মোটামুটিভাবে রাজনৈতিক স্থিতিশীলতা বিদ্যমান। পর পর দুটি গণতান্ত্রিক সরকার সুষ্ঠু নির্বাচনের মাধ্যমে ক্ষমতায় এসেছে। সংসদীয় পদ্ধতির সরকার ব্যবস্থা প্রবর্তিত হয়েছে।

সরকারকে এখন এই বিষয়টি ভাবতে হবে যে, শুধুমাত্র অর্থনৈতিক সংস্কার ও ঢালাও উদারীকরণনীতি দেশের উন্নতির একমাত্র ফর্মুলা নয়; বরং এগুলো নিশ্চিত করার জন্য দরকার সুশাসন জবাবদিহিতা ও রাজনৈতিক স্থিতিশীলতা। মৌলিক চাহিদা, ন্যূনতম নাগরিক অধিকার, সুশাসন, জবাবদিহিতা প্রভৃতি পরিপূরণে সরকার ব্যর্থ হলে জনগণের প্রত্যাশা উপেক্ষিত হবে। পরিণামে আন্দোলন ও রাজনৈতিক অস্থিতিশীলতা সৃষ্টি হবে। পিছন ফিরে তাকালে দেখা যাবে যে, দেশের প্রথম রাষ্ট্রপতি শেখ মুজিবুর রহমান এবং রাষ্ট্রপতি জিয়াউর রহমান উভয়েই এই রাজনৈতিক অস্থিতিশীলতার কারণে নিহত হন। পরবর্তীকালে ১৯৯০ সালে সামরিক শাসক হোসেন মোঃ এরশাদও জনতার আন্দোলনের মুখে নতি স্বীকার করে পদত্যাগে বাধ্য হন। আমরা জানি রাজনৈতিক অস্থিতিশীলতার কারণে ঘন-ঘন সরকার পরিবর্তন ঘটে যেটা দেশের নিরাপত্তার জন্য হুমকিস্বরুপ। প্রতিদ্বন্দ্বী রাষ্ট্রগুলো তাঁদের মনোনীত পুতুল সরকার চাপিয়ে দেয়ার সুযোগ পেয়ে যায় এর ফলে। বাংলাদেশের মূল জাতীয় ইস্যুগুলির ব্যাপারে প্রধান রাজনৈতিক দলগুলোর মতদ্বৈততার ফলে রাজনৈতিক অস্থিতিশীলতা সাধারণত মাথাচাড়া দিয়ে উঠে। জাতীয়তাবাদ, জাতীয় উন্নয়ন কৌশল, মৌলবাদী রাজনীতি তথা জাতীয় রাজনীতিতে ধর্মীয় বিষয়াদির অপপ্রয়োগ বা ধর্মের স্থান ইত্যাদি ব্যাপারে প্রধান রাজনৈতিক দলসমূহের ভিন্ন ভিন্ন দর্শন ও দৃষ্টিভঙ্গি কাজ করায় বিরোধ প্রবলতর হয়ে উঠছে।

রাজনৈতিক অস্থিতিশীলতা সাধারণত অর্থনৈতিক অনগ্রসতার কারণে সৃষ্ট হয়। অর্থনীতি ও রাজনীতি পরস্পর সংযুক্ত একটি অবিচ্ছেদ্য প্রক্রিয়া। এই গুরুত্বপূর্ণ বিষয় দুটো প্রতিনিয়ত একে অপরকে প্রভাবিত করছে। অর্থনৈতিক উন্নয়ন কৌশল নির্ধারণের ক্ষেত্রে রাজনৈতিক টানাপোড়েন সৃষ্টি হলে দেশের পরিস্থিতি ভারসাম্যহীন হবে। আবার রাজনৈতিক অঙ্গন কোন কারণে উত্তপ্ত হলে

অর্থনৈতিক অগ্রগতিও ব্যহত হবে। ক্ষমতাসীন এলিটগোষ্ঠী কায়েমী স্বার্থ প্রলম্বিত করার জন্য তাঁদের অনুগ্রহপুষ্ট ব্যক্তিবর্গকে অর্থনৈতিক কর্মকান্ডের বেনিফিশিয়ারী করে থাকেন। বঞ্চিত জনগোষ্ঠী ফলে ক্ষুব্ধ হয়। বিরোধী রাজনৈতিক দল এই পর্যায়ে ইন্ধনদাতার ভূমিকায় অবতীর্ণ হয়ে থাকে। রাজপথ শ্লোগানে মুখরিত হতে থাকে। এভাবেই সৃষ্টি হয় রাজনৈতিক বিশৃঙ্খলা। উদাহরণস্বরূপ বলা যায় যে, সরকারের প্রাইভেটাইজেশন নীতির পক্ষে-বিপক্ষে ইতোমধ্যেই এ ধরণের ঘটনা ঘটে গেছে। রাজনৈতিক অস্থিতিশীলতার আরেকটি কারণ হল আমাদের দেশে রাজনৈতিক দলগুলোর কোন সুনির্দিস্ট কোড অফ কনডাক্ট নেই। খোদ জাতীয় সংসদের ভিতরে বসেই সাংসদগণ একে অপরের বিরুদ্ধে অশালীন মন্তব্য ছুড়ে দেন। রাজনৈতিক প্রতিষ্ঠানগুলো যথার্থ অর্থে শক্তিশালী না হওয়ায় বুনিয়াদি কিছু ঘাটতি রয়ে গেছে। গণতন্ত্রের চর্চা অব্যাহত থাকলে আশা করা যায় এই ঘাটতিগুলো কাটিয়ে উঠা যাবে।

(৩) উপজাতীয় বিচ্ছিন্নতাবাদ

বাংলাদেশের মোট জনসংখ্যার ১% হল বিভিন্ন ক্ষুদ্র জাতি-গোষ্ঠী। এর মধ্যে চাকমা, সাঁওতাল, মারমা, মুরং, খাসিয়া, গারো প্রভৃতি উল্লেখযোগ্য। এসব জাতি-গোষ্ঠী উপজাতি নামে সমধিক পরিচিত। পার্বত্য চট্টগ্রাম অঞ্চলে ১৩টি জাতি-সত্তা বসবাস করে। তন্মধ্যে চাকমা গোষ্ঠী মোট পার্বত্য উপজাতির প্রায় ৫০% গঠন করে। উল্লেখ্য পার্বত্য চট্টগ্রাম অঞ্চলের আয়তন দেশের মোট ভূমির শতকরা ১০ ভাগ।

পার্বত্য চট্টগ্রামের উপজাতি বিচ্ছিন্নতাবাদ আন্দোলন শুরু হয় স্বাধীনতার পর পরই ১৯৭৩ সনে। চাকমা সম্প্রদায় পার্বত্য চট্টগ্রামের জন্য একটি বিশেষ মর্যাদা প্রদানের দাবী জানিয়ে আসছিল। পরবর্তিতে তাঁরা পার্বত্য চট্টগ্রাম জনসংহতি সমিতি নামে একটি রাজনৈতিক দলরূপে আত্মপ্রকাশ করে। এই রাজনৈতিক দলের নিয়ন্ত্রণে একটি সশস্ত্রবাহিনী ছিল। এই বাহিনী শান্তিবাহিনী নামে পরিচিত। এই শান্তিবাহিনী গত ২৩ বছর দেশের শান্তি সার্বভৌমত্বের প্রতি একটি হুমকি স্বরূপ বিরাজ করছিল। অবশেষে ১৯৯৭ সনের ডিসেম্বর মাসে সরকারের সাথে পার্বত্য চট্টগ্রাম জনসংহতি সমিতির শান্তিচুক্তি স্বাক্ষরিত হয়।

শান্তি চুক্তি স্বাক্ষরের পর পাহাড়ের পরিস্থিতি এখন শান্ত। কিন্তু সম্প্রতি শান্তি চুক্তি বিরোধী পাহাড়ী ছাত্র পরিষদ, পাহাড়ে আবার অসন্তোষের ধূম্রজাল বিস্তার করতে চাইছে। তারা মাঝে মধ্যেই প্রতিপক্ষের নেতা-কর্মীদের অপহরণ করে মুক্তিপণ চাইছে। অধিকন্তু, শান্তিবাহিনীর শীর্ষ নেতা সন্তু লারমা শান্তি চুক্তি সঠিকভাবে বাস্তবায়িত হচ্ছেনা বলে সরকারের বিরুদ্ধে অভিযোগ তুলছেন। গত ০৪-০১-২০০১ সন্তু লারমা প্রধান মন্ত্রী শেখ হাসিনার সাথে সাক্ষাৎ শেষে অভিযোগ করেন "চুক্তি বাস্তবায়নের ব্যাপারে সরকারের তরফ থেকে ব্যাপক অনিয়ম রয়েছে। বাস্তবায়নে কোন মৌলিক অগ্রগতি আমরা দেখতে পাচ্ছিনা" (সূত্র ঃ ইউ, এন, বি, ০৫-০১-২০০১)। অর্থাৎ অসন্তোষ আবার দানা বাঁধতে শুরু করেছে। সরকারকে সর্বোচ্চ সতর্কতার সাথে এই পরিস্থিতি সামাল দিতে হবে।

(৪) পরিবেশ দূষণ

মেক্সিকো সিটি কিছুকাল পূর্বেও পৃথিবীর দূষিত শহরগুলির তালিকাটিতে শীর্ষতম স্থান অধিকর করে ছিল। কিন্তু সাম্প্রতিককালে ঢাকা মহানগরী পরিবেশ দূষণের ক্ষেত্রে মেক্সিকো সিটিকে টপকে প্রথম স্থানটি দখল করে নিয়েছে। বাংলাদেশের পরিবেশগত চিত্র মোটেই ভাল নয়। বায়ুদূষণ, পানিদূষণ, ব্যাপকহারে বনোজাড়, যত্রতত্র বৃক্ষনিধন, গাড়ীর কালো ধোঁয়া প্রভৃতি ক্রমাগত হারে পরিবেশ দূষণ প্রক্রিয়া অব্যাহত রেখেছে। অতিবৃষ্টি/অনাবৃষ্টি, খরা প্রভৃতি পরিবেশ অব্যবস্থাপনারই ফলাফল। এছাড়া বছরওয়ারী বন্যা একটি নিয়মিত ঘটনা হয়ে দাঁড়িয়েছে। পাহাড়ী অঞ্চলে পাহাড়ী ঢল ও পাহাড় ধসের ফলে যথেষ্ট সংখ্যক জানমালের ক্ষতি হয়ে থাকে। এই সব প্রাকৃতিক দুর্যোগে দেশের অবকাঠামো সুবিধাদি ধ্বংস হয়, মূল্যবান সম্পদ বিনষ্ট হয় সর্বোপরি জাতীয় অর্থনীতি ভেঙ্গে পড়ার উপক্রম হয়। ১৯৮৮ ও ১৯৯৮ সনের বন্যার ক্ষয়ক্ষতির আর্থিক চিত্র তুলে ধরলেই বুঝা যাবে প্রাকৃতিক দুর্যোগ, যা পরিবেশ দূষণের ফলাফল, দেশের নিরাপত্তার জন্য কত বড় হুমকি স্বরূপ। ১৯৮৮ সনের বন্যায় দেশের তিন চতুর্থাংশ ভূমি তলিয়ে যায় যার পরিমাণ ৮৯,৯৭০ বর্গ কিঃ মিঃ। ১৯৯৮ সালের ক্ষয়ক্ষতির হিসাব নিম্নে প্রদত্ত হলো ঃ

সারণী ৩। বন্যা ১৯৯৮

ক্ষতিগ্রস্ত জেলার সংখ্যা	৫২	ক্ষতিগ্রস্ত থানার সংখ্যা	৩৬৬	ক্ষতিগ্রস্ত ইউনিয়ন পরিষদের সংখ্যা	৩৩২৩
ক্ষতিগ্রস্ত ফসলি জমি	১৪২৩৩২০ একর	ক্ষতিগ্রস্ত ঘরবাড়ীর সংখ্যা	৯৮০৫৭১	মৃতলোকের সংখ্যা	৯১৮ জন
মৃত গবাদি পশুর সংখ্যা	২৬৫৬৪	ক্ষতিগ্রস্ত রাস্তা	১৫৯২৭ কিঃ মিঃ	ক্ষতিগ্রস্ত বাঁধ	৪৫২৮ কিঃ মিঃ
ক্ষতিগ্রস্ত শিক্ষা প্রতিষ্ঠান	১৭১৮	ক্ষতিগ্রস্ত ব্রীজ, কালভার্ট	৬৮৯০	ক্ষতিগ্রস্ত লোকের সংখ্যা	৩০৯১৬৩৫১

সূত্র ঃ ইমারজেন্সী অপারেশন সেন্টার ঃ দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা ও ত্রাণ মন্ত্রণালয় ১৯৯৮।

উপরের সারণী থেকে এটা স্পষ্ট প্রতীয়মান যে, একেকটি প্রলয়ংকরী বন্যা দেশের অর্থনীতিকে দেউলিয়াত্বের পর্যায়ে নিয়ে যেতে পারে। এল নিনো ও লা নিনার প্রভাবের ফলে বাংলাদেশ এই সব প্রাকৃতিক দুর্যোগের কবলে বারংবার পতিত হচ্ছে। পরিবেশের সুষ্ঠু সংরক্ষণের প্রভাবে এগুলো অতীতের চেয়ে বেশী মাত্রায় হচ্ছে। এছাড়া নির্বিচারে বনোজাড়, মাত্রাতিরিক্ত কীটনাশকের ব্যবহার পরিবেশের সমূহ ক্ষতি সাধন করছে। বাংলাদেশের ৬৪টি জেলার মধ্যে ২৮টি জেলায় কোন বনাঞ্চল নেই। একটি দেশে যেখানে Ecological ভারসাম্য বজায় রাখার জন্য শতকরা ২৫ ভাগ বনাঞ্চল থাকা আবশ্যক সেখানে বাংলাদেশের রয়েছে শতকরা ৬-৮ ভাগ বনাঞ্চল। কীটনাশকের বিষাক্ত প্রভাব বায়ু, পানি, উদ্ভিদ, প্রাণীসহ সামগ্রিকভাবে খাদ্যচক্রে প্রবেশের মাধ্যমে Life Support System ভেঙ্গে যায়। ফলে জীবন চক্র হুমকির সম্মুখীন হয়। কৃষি উৎপাদন বৃদ্ধির জন্য কীটনাশকসহ নাইট্রোজেন, ইউরিয়া ও ফসফরাস সমৃদ্ধ কৃত্রিম সারের অস্বাভাবিক ব্যবহারের কারণে ভূগর্ভস্থ ও ভূ-উপরিস্থ পানি দূষিত হচ্ছে। এক সমীক্ষায় দেখা যায় এদেশে মানুষের দেহে ১৩-৩১ পিপিএম ডিডিটি

পাওয়া যায় যেখানে যুক্তরাষ্ট্রের, জার্মানী ও যুক্তরাজ্যে এর পরিমাণ যথাক্রমে ৫.২, ২.৩ ও ২.২ পিপিএম (হোসেন ও ইমাম, ১৯৯৮)। এছাড়া বিশ্বব্যাপী উষ্ণতাবৃদ্ধির ফলে বাংলাদেশের ১১.৪% ভূমি সমুদ্রগর্ভে বিলীন হয়ে যাবে যদি সমুদ্রের উচ্চতা ৩ ফুট বেড়ে যায় (Wirth, 1989)। সুতরাং পরিবেশ দূষণ যথাযথভাবে সম্বোধিত না হলে দেশের ভবিষ্যত হুমকির সম্মুখীন হবে।

খ) বৈদেশিক হুমকিসমূহ

(১) বৈদেশিক সাহায্যের উপর মাত্রাতিরিক্ত নির্ভরশীলতা

তথ্য মহাসারণী, বিশ্বায়ন, বহুজাতিক কোম্পানীগুলির তৎপরতা প্রভৃতি বিশ্বঅর্থনীতিতে গতিসঞ্চার করলেও তৃতীয় বিশ্বের একটি উন্নয়নশীল দেশ হিসেবে বাংলাদেশ এই অসম প্রতিযোগিতায় টিকে থাকতে হিমশিম খেয়ে যাচ্ছে। ফলশ্রুতিতে বাংলাদেশকে ক্রমবর্ধমান হারে দাতাদেশ/সংস্থাসমূহের দ্বারস্থ হতে হচ্ছে। আর স্বাভাবিক নিয়মেই বাংলাদেশের বৈদেশিক ঋণের পরিমাণ বেড়ে চলেছে। ১৯৭১-৭২ থেকে ১৯৯৭-৯৮ পর্যন্ত বাংলাদেশের ঋণের পরিমাণ বেড়ে ১৮০০৪ মিলিয়ন মার্কিন ডলারে দাঁড়িয়েছে (সূত্রঃ বাংলাদেশ অর্থনৈতিক সমীক্ষা ২০০০)।

একথা সত্য যে, উন্নয়নের জন্য বৈদেশিক সাহায্যের প্রয়োজন। কিন্তু মাত্রাতিরিক্ত বৈদেশিক সাহায্য গ্রহীতা রাষ্ট্রের স্বাধীনতাকে খর্ব করে। সিদ্ধান্ত গ্রহণের ক্ষেত্রে সেটা অভ্যন্তরীণ হোক আর বৈদেশিক হোক দাতা দেশসমূহ সবসময় নিজস্ব পছন্দ-অপছন্দের শর্তগ্রহীতা রাষ্ট্রসমূহের উপর চাপিয়ে দেয়। সম্প্রতি সায়দাবাদ ওয়াটার ট্রিটমেন্ট প্ল্যান্টের ব্যাপারে বিশ্বব্যাংক হস্তক্ষেপ করে ও বাংলাদেশ সরকারের প্রতি প্রচ্ছন্ন হুমকি ছুড়ে দেয় এই বলে যে, তাদের নির্ধারিত শর্ত না মানা হলে ওয়াটার ট্রিটমেন্ট প্ল্যান্টে অর্থায়ন করা হবে না।

(২) রোহিঙ্গা শরণার্থী সমস্যা

রোহিঙ্গা সমস্যা আজো বাংলাদেশের মাথা ব্যথার কারণ। উল্লেখযোগ্য সংখ্যক রোহিঙ্গা শরণার্থী এখনও বাংলাদেশে অবস্থান করছে। ১৯৭৮ সনে সর্বপ্রথম

রোহিঙ্গা শরণার্থীরা বিতাড়িত হয়ে বাংলাদেশে আশ্রয় নেয়। ১৯৭৯ সনে এক দ্বিপাক্ষিক সমঝোতার মাধ্যমে এই সব শরণার্থীদের প্রত্যাবাসন প্রক্রিয়া সম্পন্ন হয়। ১৯৯২ সনে পুনরায় রোহিঙ্গারা দলে দলে বাংলাদেশে প্রবেশ করে। তিন লক্ষ রোহিঙ্গা শরণার্থী এই সময় বাংলাদেশে আশ্রয় নেয়। জাতিসংঘ শরণার্থীবিষয়ক হাই কমিশনের তৎপরতায় দ্রুত প্রত্যাবাসন প্রক্রিয়া শুরু হওয়ায় সিংহভাগ রোহিঙ্গা শরণার্থী প্রত্যাবাসিত হয়। কিন্তু বেশ কিছু সংখ্যক রোহিঙ্গা শরণার্থী অদ্যাবধি প্রত্যাবাসনের অপেক্ষায় রয়েছে।

রোহিঙ্গা মায়ানমারের একটি ক্ষুদ্র জাতিগোষ্ঠী। তাঁরা আরাকানের সংখ্যাগুরু সম্প্রদায় হওয়া সত্ত্বেও সরকারের নিপীড়ন নির্যাতনের মাত্রা তাঁদের উপর বেশী এই কারণে যে রোহিঙ্গারা নাকি মায়ানমারের আদি জনগোষ্ঠী নয়। কেননা তারা ইসলাম ধর্মে বিশ্বাসী। রোহিঙ্গা শরণার্থী প্রত্যাবাসনে অযথা কালক্ষেপণ করায় মায়ানমারের সাথে বাংলাদেশের সম্পর্কে টানাপোড়েন সৃষ্টি হয়েছে। মায়ানমারে বর্তমানে একটি সামরিক সরকার ক্ষমতাসীন। ১৯৭৮ ও ১৯৯২ এর পুনরাবৃত্তি যে এই সামরিক সরকার ঘটাবে না এর কোন নিশ্চয়তা নেই। বাংলাদেশ সরকারের এই ব্যাপারে আরো সতর্ক ও পর্যবেক্ষণশীল হতে হবে।

(৩) মাদক চোরাচালান

গোল্ডেন ট্রায়াংগল (লাওস, মায়ানমার এবং থাইল্যান্ড), গোল্ডেন ওয়েজ এবং গোল্ডেন ক্রিসেন্ট (আফগানিস্তান, ইরান ও পাকিস্তান) এই এলাকা তিনটি ভৌগোলিকভাবে বাংলাদেশের সন্নিহিত হওয়ায় মাদক চোরাচালানের ক্ষেত্রে বাংলাদেশ একটি আদর্শ ট্রানজিট পয়েন্ট হিসেবে বিবেচিত হচ্ছে। সুতরাং ভৌগোলিকভাবে বাংলাদেশ একটি বিপদাপন্ন পরিস্থিতির মধ্যে রয়েছে। মাদক বিক্রয়/সেবন ও চোরাচালান ইতোমধ্যেই বাংলাদেশে নানাবিধ সামাজিক সমস্যা সৃষ্টি করছে।

(৪) আঞ্চলিক অস্থিতিশীলতা

ভারত ও পাকিস্থান কর্তৃক ১৯৯৮ সনে আণবিক বোমা বিস্ফোরণের পর থেকে

দক্ষিণ এশীয় আঞ্চলিক স্থিতিশীলতা হুমকির সম্মুখীন হয়ে পড়েছে। একটি ঘনিষ্ঠ প্রতিবেশী দেশ হিসেবে বাংলাদেশ এই ঘটনা পরম্পরার প্রভাব থেকে বিযুক্ত হতে পারে না। বরং Nuclearized দক্ষিণ এশিয়ার একটি অংশ হিসেবে বাংলাদেশের নিরাপত্তাও এতে বিঘ্নিত হয়েছে। আণবিক বোমা বিস্ফোরণের পর পরই মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর উদ্বেগ প্রতিধ্বনিত হয়েছে গত ১৯৯৮ সনের ৩রা জুন যখন তিনি বান্দরবন ক্যান্টনমেন্টে জওয়ানদের উদ্দেশ্যে বক্তব্য প্রদান করেন। এই বক্তব্যে তিনি দেশের জাতীয় নিরাপত্তা কৌশলে পরিবর্তন আনয়নের উপর গুরুত্বারোপ করেন। কেননা ইন্দো-পাক সম্পর্কের বৈরিতা অর্ধশতাব্দীকালেরও বেশী প্রাচীন। এ যাবত দুটি দেশের মধ্যে তিনটি যুদ্ধ সংঘটিত হয়ে গেছে। চতুর্থ যুদ্ধটি যে আণবিক যুদ্ধ হবে না তার কোন নিশ্চয়তা নেই। ভারত ১৯৭৪ সনে আণবিক বোমার অধিকারী হয়। পরবর্তীতে ১৯৯৮ সনের ১১ ও ১৩ই মে অকস্মাৎ রাষ্ট্রটি আবার আণবিক বোমার বিস্ফোরণ ঘটায়। প্রায় একই সময়ে অর্থাৎ ১৯৯৮ সনের ২৮শে ও ৩০শে মে পাকিস্থানও 'Retaliatory Nuclear Detonation' এর মাধ্যমে আণবিক রাষ্ট্রে পরিণত হয়। যে কোন ক্রিয়া/শক্তির একটি বিপরীত প্রতিক্রিয়া আাছে। উদাহরণ স্বরূপ ১৯৪৫ সনে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র আণবিক রাষ্ট্রে পরিণত হওয়ার পর পরই একই পথ অনুসরণ করে তদানীন্তন সোভিয়েট ইউনিয়ন, যুক্তরাজ্য, ফ্রান্স ও গণচীন।

জন্মলগ্ন থেকেই ভারত ও পাকিস্থান একে অপরের চরম শত্রু। দেশ বিভাগের প্রাক্কালে প্রায় দশ লক্ষ লোক হতাহত হয় এবং আরো এক কোটি পঞ্চাশ লক্ষ লোক সীমান্ত বদল করে। কাজেই আণবিক শক্তির অধিকারী এই দুই শত্রুদেশের মধ্যে আরেকটি যুদ্ধ শুরু হলে আশ্চর্য হওয়ার কিছুই থাকবে না। 'Accidental Nuclear Holocaust' এর ব্যাপারটিও একেবারে উড়িয়ে দেয়া যায় না। কেননা আণবিক প্ল্যান্টের নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থা অত্যন্ত দুরূহ, সূক্ষ্ম ও স্পর্শকাতর। নিয়ন্ত্রণ-ব্যবস্থার উপর অভ্রান্ত দখল অদ্যাবধি এই দুটো দেশ আয়ত্ত্ব করতে পারেনি। ফলে দুর্ঘটনাক্রমে আণবিক বোমা বিস্ফোরণের ঝুঁকি রয়ে গেল। এর ফলে দক্ষিণ এশিয়ার অন্যান্য পরমাণুযুক্ত রাষ্ট্রসমূহের মধ্যে চরম নিরাপত্তা বিরাজ করছে। কেননা অকস্ম্যাৎ কোন অ-বিশ্বস্ত অঙ্গুলীহেলনে পুরো

চিত্রপট বদলে যেতে পারে। Command and Control ব্যবস্থা ও Fail safe mechanism দুর্ঘটনামূলক আণবিক বিস্ফোরণ এড়ানোর চাবিকাঠি। আতংকজনক হলেও এই ব্যবস্থা ভারত বা পাকিস্থান কোন রাষ্ট্রেরই নেই। কারো অসাবধানতা বশত যদি আণবিক বিস্ফোরণ ঘটে তবে Nuclear Fallout এর ভয়াবহতা থেকে এই অঞ্চলের কোন রাষ্ট্রই পরিত্রাণ পাবে না। পারমাণবিক তেজস্ক্রিয়তার বিষবাষ্প পুরো দক্ষিণ এশিয়ায় ছড়িয়ে যাবে।

ভারতে বর্তমানে একটি উগ্র জাতীয়তাবাদী ধর্মভিত্তিক রাজনৈতিক সরকার ক্ষমতায় অধিষ্ঠিত। ১৯৬৪ সনে যখন চীন আণবিক বিস্ফোরণ ঘটায় তখন মিঃ অটল বিহারী বাজপেয়ী, যিনি ভারতের বর্তমান প্রধান মন্ত্রী,পার্লামেন্টে ক্রোধভরে বলেছিলেন "The answer to an atom bomb is an atom bomb nothing else" (নিউজউইক, অক্টোবর ১৯, ১৯৯৮, পৃঃ ১৩০)। মিঃ অটলবিহারী বাজপেয়ী এখন ভারতের প্রধানমন্ত্রী। আর পাকিস্থানেও বর্তমানে একটি সামরিক সরকার ক্ষমতাসীন। সুতরাং দক্ষিণ এশিয়া একটি নাজুক পরিস্থিতির মুখোমুখি একথা বলাই বাহুল্য। আঞ্চলিক স্থিতিশীলতা ইতোমধ্যেই পুরোনো দিনের ইতিকথায় রূপান্তরিত হওয়ার পথে।

(৫) অস্ত্র চোরাচালান

আন্তর্জাতিক অস্ত্র চোরাচালানীদের জন্য ভারত ও মায়ানমারের বিচ্ছিন্নতাবাদী দলগুলি আশীর্বাদ স্বরূপ। এদের কাছে কোটি কোটি টাকার অস্ত্রের চালান পৌঁছে যায় বাংলাদেশের মধ্য দিয়ে। আসামের উলফা গেরিলারা অস্ত্র সাহায্য প্রায় বাংলাদেশের অভ্যন্তর থেকে এ অভিযোগ ভারত বহু আগে থেকেই করে আসছে। মায়ানমারের বিদ্রোহী গ্রুপগুলো অস্ত্রের চালান বাংলাদেশের দক্ষিণ-পূর্বাঞ্চল থেকে সংগ্রহ করে থাকে। সন্দেহ করা হয় বঙ্গোপসাগরের গভীর সমুদ্রে এসব অস্ত্রের চালান খালাস হয়। ট্রলার যোগে এই সব অস্ত্রের চালান পরবর্তীতে সারা দেশে ছড়িয়ে পড়ে। সুতরাং এই ব্যাপার সরকারকে কঠোর নীতি গ্রহণ করতে হবে। নচেৎ দেশের আইন শৃংখলা পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণের বাইরে চলে যাবে।

(৬) অমিমাংসিত ম্যারিটাইম (Maritime) ইস্যুসমূহ

বাংলাদেশের সাথে ভারত ও মায়ানমারের Maritime boundary এখন পর্যন্ত চিহ্নিত হয়নি। সংলাপের ভিত্তিতে এই ইস্যুর সমাধান সম্ভব হয়নি দেশগুলোর স্ব স্ব জাতীয় দৃষ্টিভঙ্গিভিত্তিক সমুদ্র আইনের ব্যাখ্যার কারণে। Maritime area-র উপর রাষ্ট্রসমূহের বিরোধপূর্ণ অবস্থানের কারণে সমুদ্র ও সমুদ্রতলের অফুরন্ত সম্পদরাজি থেকে বাংলাদেশের মত দরিদ্র দেশ বঞ্চিত হচ্ছে। উপরন্তু, সম্পদ-বঞ্চিত এই দেশটির সমুদ্র সীমায় প্রায়শই বিদেশী দস্যু নৌযানসমূহ হানা দিয়ে অবৈধভাবে কোটি টাকার মৎস্য সম্পদ নিয়ে যাচ্ছে। সুতরাং অবিলম্বে বাংলাদেশের অর্থনৈতিক সমুদ্র সীমা চিহ্নিত করা প্রয়োজন।

বাংলাদেশের নীতি অবস্থান ও করণীয়সমূহ

উপর্যুক্ত আলোচনার ভিত্তিতে এটাই প্রতীয়মান হয় যে, বাংলাদেশের নিরাপত্তা ঝুঁকি প্রধানত দুই প্রকার–অভ্যন্তরীণ ও বৈদেশিক। কিন্তু প্রকৃতিগতভাবে অভ্যন্তরীণ হুমকিই বেশী গুরুত্ব বহন করে। সময়োচিত পদক্ষেপের মাধ্যমে এইসব হুমকি মোকাবেলা করতে হবে। এই ব্যাপারে সরকারী ও বেসরকারী পর্যায়ে যথেষ্ট সচেতনতা লক্ষ্য করা গেছে। এটা একটি ইতিবাচক দিক। ১৯৮২ সালে জাতীয় নিরাপত্তা কাউন্সিল গঠন এই সচেতনতার প্রমাণ। জাতীয় নিরাপত্তা কাউন্সিলের চেয়ারম্যান হলেন পদাধিকার বলে দেশের প্রেসিডেন্ট। এই কাউন্সিল নিয়মিতভাবে জাতীয় নিরাপত্তা বিষয়ে সরকারকে উপদেশনা ও সাহায্য প্রদান করে থাকে। বেসরকারী পর্যায়ে দেখা যাচ্ছে যে, এনজিওসমূহ উন্নয়নের মাধ্যমে নিরাপত্তা নিশ্চিতকরণে উৎসাহী। সামরিক নিরাপত্তার বিষয়টি এন জিওগুলোর কাছে কম গুরুত্ব পেয়ে থাকে। কেননা তাঁরা দেশের অর্থনৈতিক উন্নয়নের পথে বিশাল সামরিক বাজেটকে প্রতিবন্ধকতা হিসেবে চিহ্নিত করে থাকে। অর্থাৎ অর্থনৈতিক উন্নয়নই হল নিরাপত্তার ভিত্তি। নিজস্ব নিরাপত্তার জন্য উপযোগী কোন সিদ্ধান্তে উপনীত হওয়ার আগে সংশ্লিষ্ট দেশটিকে পূর্বাহ্নেই তার জাতীয় শক্তি ও লক্ষ্যসমূহ নিরূপণ করতে হবে। সি, আই, এ (CIA)-র সাবেক উপ-পরিচালক Dr. Ray S. Cline জাতীয় শক্তি নিরূপণের জন্য নিম্নরূপ একটি ফর্মূলা প্রদান করেছে (Islam, 2000) ঃ

PP = (C+E+M) ×S+W

এখানে,

PP = Perceived National Power

C = Critical Mass

(C = Population + Territory)

E = Economic Power

M = Military Power

S = Strategic Objectives of the Nation

W = Will Power of the Nation

একটি দেশের ক্রিটিক্যাল মাস, অর্থনৈতিক শক্তি এবং সামরিক শক্তিকে দেশটির কৌশলগত লক্ষ্য ও ইচ্ছা শক্তি দ্বারা গুণনের পর যা অবশিষ্ট থাকে তাই হল জাতীয় শক্তি। এই প্রসঙ্গে স্মর্তব্য যে, জাতীয় শক্তির দুই প্রকার উপাদান রয়েছে- Tangible elements of national power আর Intangible elements of national power। ভূ-প্রকৃতি, ভৌগোলিক অবস্থান, আয়তন, আবহওয়া, প্রাকৃতিক ও খনিজসম্পদ, কাঁচামাল, মানবসম্পদ প্রভৃতি সবই হল জাতীয় শক্তির Tangible উপাদান। পক্ষান্তরে সাংগঠনিক ক্ষমতা, নেতৃত্বের গুণাবলী, সরকার পদ্ধতি, সামাজিক স্তর বিন্যাস, নীতিবোধ, জনগণের ঐক্য প্রভৃতি হল Intangible উপাদান। পরিবর্তিত বিশ্ব পেক্ষাপট ও জাতীয় শক্তির নিরিখে নিম্নবর্ণিত পদক্ষেপসমূহ দেশের নিরাপত্তা ব্যবস্থাকে আরো জোরদার করবে বলে আশা করা যায়।

প্রথমতঃ একটি সুসমন্বিত অভ্যন্তরীণ নিরাপত্তা নেটওয়ার্ক গড়ে তোলা প্রয়োজন যেখানে দেশের আর্থসামাজিক ও রাজনৈতিক বিষয়গুলোই বেশী প্রাধান্য পাবে। আর্থ-সামাজিক খাতে কোন রকম বৈষম্য ও বিশৃংখলা দেখার সাথে সাথে তা নির্মূলের জন্য যথাযথ ব্যবস্থা গ্রহণের ব্যবস্থা নিতে হবে। এ সব ষড়যন্ত্র উৎখাতের ব্যাপারে সরকারকে সাহসী ও সদাসতর্ক হতে হবে। কারণ, রাজনৈতিক অস্থিতিশীলতা দেশের নিরাপত্তার জন্য একটি প্রবল হুমকি।

উদাহরণ স্বরূপ আমরা চীনের ছাত্র আন্দোলনের কথা উল্লেখ করতে পারি। ১৯৮৯ সনে ভিয়েনআনমেন স্কোয়ারে বিশাল ছাত্র বিক্ষোভ সমগ্র চীনকে কাঁপিয়ে দিয়েছিল।

দ্বিতীয়তঃ কূটনৈতিক দক্ষতাকে বাংলাদেশ নিজ নিরাপত্তা সংরক্ষণে একটি ফলপ্রসূ অস্ত্র হিসেবে ব্যবহার করতে পারে। এ জন্য দরকার বিশ্বমানের কূটনৈতিক দক্ষতা। সরকারকে এ ব্যাপারে মনোযোগী হতে হবে। কেননা আমাদের দরকার নিবেদিতপ্রাণ ও দক্ষ একদল কূটনীতিক। বাংলাদেশের মত ক্ষুদ্র রাষ্ট্রগুলোর বৈদেশিকনীতির মূল প্রতিপাদ্য হল আক্রমণ নয় বরং আত্মরক্ষা। এ জন্য দরকার বৈদেশিক নীতির দক্ষ ব্যবস্থাপনা ও প্রয়োগ। সিঙ্গাপুরের দূরদর্শী নেতা লি কুয়ান ইউ এর মধ্যে আমরা এ ধরণের দৃষ্টান্ত পাই। আমরা জানি সিঙ্গাপুরের জনসংখ্যার প্রায় ৮০ ভাগ হলো চীনা বংশোদ্ভূত। এই চীনা জনগণের কারণেই সিঙ্গাপুরকে বিচ্ছিন্ন হতে হয়েছিল মালয়েশীয় ফেডারেশন থেকে। এই চীনা বংশোদ্ভূত গোষ্ঠী গোটা দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ায় ঘৃণার পাত্র। লী কুয়ান ইউ এটা ক্রমাগতভাবে সতর্ক করে দিয়েছেন যে, "যদি তোমরা চীনা শোভিনিষ্টিক সমাজ চাও, তবে ব্যর্থতা নিশ্চিত। এতে সিঙ্গাপুর অবশ্যম্ভাবীরূপেই বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়বে। এমনকি যদি তোমারা বিচ্ছিন্ন নাও হও তবে তোমরা তোমাদের শোভিনিষ্টিক প্রভাব প্রতিবেশী (মালয়েশিয়া)-র দিকে প্রসারিত কর, তবে অন্য কোন বিকল্প না পেলে তারা তোমাদের সঙ্গে বোঝাপোড়া করতে আরেক বৃহৎ প্রতিবেশী (ইন্দোনেশিয়া)-র সঙ্গে এক হবে" (Morrison, 1978)।

লী কুয়ান সর্বদাই সংখ্যা সাম্যে বিশ্বাসী ছিলেন। তিনি সিঙ্গাপুরে একটি বহুজাতিভিত্তিক সমাজ গড়ে তুলতে চেয়েছেন। চীনা প্রধান সমাজের প্রতিফলন সিঙ্গাপুরে যেন না পড়ে এই বিষয়ে লি-র সতর্ক দৃষ্টি ছিল। লি-র কূটনৈতিক প্রচেষ্টা ছিল থাইল্যান্ডে মার্কিন সৈন্যদের উপস্থিতি দীর্ঘায়িত করা। কেননা তিনি বিশ্বাস করতেন সিঙ্গাপুরের নিরাপত্তা নিহিত আছে থাই সীমান্তে। থাইল্যান্ড থেকে মার্কিন সৈন্যদলের প্রত্যাহারের পর সিঙ্গাপুরের নিরাপত্তা বিঘ্নিত হয়। লী তখন কূটনৈতিক প্রচেষ্টা চালিয়ে ১৯৭১ সনের নভেম্বরে পঞ্চশক্তি প্রতিরক্ষা

চুক্তিতে স্বাক্ষরের মাধ্যমে মালয়েশিয়ার নিরাপত্তার সঙ্গে সিঙ্গাপুরের নিরাপত্তা সংযুক্ত করেন। লি কুয়ানের কূটনৈতিক দক্ষতার ফলেই এটা সম্ভব হয়েছিল। এমনকি কম্যুনিস্ট চীনকে স্বীকৃতি দানের ব্যাপারেও তাঁর দ্বিধা ছিল। শুধুমাত্র মালয়েশিয়া ও ইন্দোনেশিয়া কর্তৃক কম্যুনিস্ট চীনকে স্বীকৃতি দানের পরই তিনি স্বীকৃতি দান করেন। অর্থাৎ সিঙ্গাপুরের লক্ষ্য ছিল দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ার অন্যান্য রাষ্ট্রের সঙ্গে কমরেডশীপ গড়ে তোলা। দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ার নন-চাইনীজ প্রধান রাষ্ট্রসমূহের খাঁটি সদস্য হবার ব্যাপারে সিঙ্গাপুরের অবিরাম প্রচেষ্টা চিল। কেননা এতে দেশটির নিরাপত্তা নিশ্চিত হবে। দক্ষ কূটনৈতিক ব্যবস্থাপনার মাধ্যমে এটা সম্ভব হয়েছিল।

বাংলাদেশকেও প্রয়োজনের সাথে তাল মিলিয়ে যুগোপযোগী কূটনীতিক প্রচেষ্টা অব্যাহত রাখতে হবে। আমরা জানি আমাদের সম্পদের সীমাবদ্ধতা রয়েছে। সীমিত সম্পদের সর্বোত্তম ব্যবহারের মাধ্যমেই উচ্চমানসম্পন্ন কূটনৈতিক গড়ে তুলতে হবে। সামরিক ব্যয় কমিয়ে কূটনৈতিক খাতে অর্থ বরাদ্দ করা যেতে পারে এই লক্ষ্যে। অধ্যাপক তালুকদার মনিরুজ্জামান এ বিষয়ে গুরুত্বপূর্ণ মন্তব্য করেছেনঃ "ক্ষুদ্র বা বৃহৎ যে কোন রাষ্ট্রের জন্যই এটা সত্য যে আন্তর্জাতিক সংঘাতের প্রশ্নে কূটনীতি হচ্ছে প্রতিরক্ষার প্রথম লাইন" (Morrison, 1978 : 33)। কাজেই সামরিক খাতে ব্যয় সংকোচন সম্ভব। Friendship to all, malice to none এই নীতির ভিত্তিতে বাংলাদেশের বৈদেশিক সম্পর্ক চলে আসছে। সুতরাং কূটনৈতিক ব্যবস্থাপনার বিষয়টি মোটেই কষ্টসাধ্য হবে না।

তৃতীয়তঃ নিরপেক্ষতা বজায়ের মাধ্যমে নিরাপত্তা ব্যবস্থার জোরদারকরণ। শেখ মুজিবুর রহমান বাংলাদেশকে এশিয়ার সুইজারল্যান্ডে পরিণত করতে চেয়েছিলেন। কিন্তু নিরপেক্ষ মর্যাদা অর্জন করা অত্যন্ত দুরূহ যদিও জাতীয় নিরাপত্তার কৌশল হিসেবে তা কার্যকরী। নিরপেক্ষ রাষ্ট্র হতে হলে কোন রাষ্ট্রকে বেশ কিছু পূর্বশর্ত পূরণ করতে হবে। প্রথমতঃ দীর্ঘকালব্যাপী যুদ্ধ এড়িয়ে চলার ঐতিহ্য থাকতে হবে ও ভবিষ্যতে কোন যুদ্ধে জড়িয়ে পড়া থেকে বিরত থাকতে হবে এবং এই সংক্রান্ত যথোপযুক্ত নীতিগ্রহণ করতে হবে। সেই সাথে নিরপেক্ষতার প্রচার কার্য চালাতে হবে যেন আন্তর্জাতিক সম্প্রদায়ের নিকট এর

বিশ্বাসযোগ্যতা প্রতিষ্ঠা পায়। দ্বিতীয়তঃ ভৌগোলিক অখন্ডতা নিশ্চিত করার জন্য শক্তিশালী সামরিকবাহিনী থাকতে হবে। তৃতীয়তঃ রাষ্ট্রটির ভৌগোলিক অবস্থান যেন কৌশলগতভাবে গুরুত্বপূর্ণ হয়। কেননা কৌশলগতভাবে গুরুত্বপূর্ণ একটি রাষ্ট্র যদি নিরপেক্ষ হয় তাহলে তা বৃহৎশক্তিগুলোর কাছে অপরিহার্য বিবেচিত হবে। চতুর্থতঃ রাষ্ট্রটির একটি স্থিতিশীল সমাজ থাকতে হবে যারা নিরপেক্ষতার জন্য অবদান রাখতে সক্ষম। সুইজারল্যান্ড এভাবেই নিরপেক্ষ মর্যাদা লাভ করেছে ১৮১৫ সনে ভিয়েনাচুক্তির মাধ্যমে। এই চুক্তির মাধ্যমে ফ্রান্স, অষ্টিয়া, গ্রেট বৃটেন, এশিয়া, পর্তুগাল ও রাশিয়া চিরস্থায়ীভাবে সুইজারল্যান্ডের নিরপেক্ষতা ও ভৌগোলিক অখন্ডতা স্বীকার করে নেয়। একটি নিরপেক্ষ রাষ্ট্র বহুবিধ সুবিধা ভোগ করে থাকে। প্রথমত ঃ কোন নিরপেক্ষ রাষ্ট্রের যুদ্ধবিগ্রহে জড়িয়ে পড়ার কোন সম্ভাবনা নেই। কাজেই সামরিক ব্যয় থাকে একেবারে ন্যূনতম। দ্বিতীয়তঃ সামরিক ব্যয় ন্যূনতম হওয়ার কারণে আর্থ-সামাজিক খাতে ব্যয় বরাদ্দ বেশী থাকে। কাজেই অর্থনৈতিক উন্নতি ত্বরান্বিত হয়। সুইডেন, সুইজারল্যান্ড ইত্যাদি নিরপেক্ষ রাষ্ট্রগুলি অত্যন্ত সমৃদ্ধ অর্থনীতির অধিকারী। তৃতীয়তঃ নিরপেক্ষ দেশগুলিকে কোন সামরিক জোটের সদস্য হতে হয় না। কাজেই জোটের কোন সৈন্যদলের ব্যয়বার নিরপেক্ষ রাষ্ট্রকে বহন করতে হয় না। এই প্রসঙ্গে জামাল আব্দুল নাসেরের মন্তব্য উল্লেখযোগ্য, একটা বৃহৎ শক্তি এবং ক্ষুদ্রশক্তির মধ্যে জোট হলো নেকড়ে ও ভেড়ার মধ্যে জোট এবং নেকড়ে কর্তৃক ভেড়াকে গোগ্রাসে গিলে ফেলার মাধ্যমেই এর পরিসমাপ্তি ঘটে। সুতরাং এটা মোটামুটি স্পষ্ট যে, সামরিক জোট বদ্ধ হওয়ার তুলনায় নিরপেক্ষ মর্যাদা লাভ একটি দেশের নিরাপত্তা কৌশলে অধিক গুরুত্ব সহকারে বিবেচিত হবে।

চতুর্থতঃ সিটিজেন্স আর্মী প্রতিরক্ষা ব্যবস্থার ক্ষেত্রে কার্যকর ভূমিকা পালন করে থাকে। সিটিজেনস আর্মী নিরাপত্তা ব্যবস্থার এমন একটি কৌশল যেখানে শারীরিকভাবে সক্ষম সকল পুরুষ ও মহিলাদের প্রতিরক্ষামূলক যুদ্ধের প্রশিক্ষণ থাকবে। তাই ক্লজভিটজ (Clausewitz) এর ভাষায় বলা চলে, জাতিকে সশস্ত্র করে তোলা হল প্রতিরক্ষার একটা বড় মাধ্যম যা প্রতিরোধের হাজারো উৎসকে জাগ্রত করে অন্যথায় সেগুলো সুপ্তই থেকে যেত (Quoted in Svcies, 1970

: 4)। আমরা জানি, ক্ষুদ্ররাষ্ট্রসমূহ শুধুমাত্র আক্রান্ত হলেই যুদ্ধে অবতীর্ণ হয়। অর্থাৎ ক্ষুদ্ররাষ্ট্র জয়ের জন্য যুদ্ধ করে না বরং আত্মরক্ষার জন্য প্রতিরোধ যুদ্ধে বিশ্বাসী। আর এই প্রতিরোধ যুদ্ধে সিটিজেন্স বাহিনী কার্যকর ভূমিকা পালন করে। ভিয়েতনাম এর প্রকৃষ্ট উদাহরণ। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের মতো পরাশক্তিকে ভিয়েতনামী প্রতিরোধে মুখে পরাজয় স্বীকার করতে হয়েছে। ১৯৩৯-৪০ সালে ফিনজাতি শতদিনব্যাপী যুদ্ধে সোভিয়েত ইউনিয়নকে প্রতিরোধ করে সম্পূর্ণ এককভাবে। এটা সম্ভব হয়েছে সমগ্র ফিনজাতির ঐক্যবদ্ধ প্রতিরোধের মুখে।

একটি দেশের ভূ-খন্ড দখল করার অর্থ এই নয় যে দেশটিকে জয় করা, বরঞ্চ যুদ্ধের সূত্রপাত হল এখানেই। অধিকৃত দেশটির উপর পূর্ণ রাজনৈতিক নিয়ন্ত্রণ স্থাপনই হলো পুরোপুরি বিজয়। কিন্তু যে দেশের জনগণ হানাদার বিদেশী বাহিনীর অনুগত্য অস্বীকারে রাজনৈতিকভাবে অঙ্গীকারাবদ্ধ ও অনুপ্রাণিত সে দেশ দখলের অর্থ হল পাগলা ঘোড়াকে বশ মানানোর মতই বৃথা প্রচেষ্টা। কেননা স্বতঃস্ফূর্ত জনপ্রতিরোধ বা সিটিজেনস আর্মীর প্রতিরোধ মানে গোটা জাতির প্রতিরোধ। ফলে যুদ্ধ প্রলম্বিত হয়। হানাদার বাহিনীর মনোবল ভেঙ্গে পড়তে থাকে। চীনে মাওয়ের জনযুদ্ধ, আমেরিকার বিরুদ্ধে গিয়াপের বিজয় প্রভৃতি সিটিজেন্স আর্মীরাই সমার্থক। তাই বাংলাদেশের মতো ক্ষুদ্ররাষ্ট্রে সিটিজেন্স আর্মী গড়ে তোলার ব্যাপারটি বর্তমান উপমহাদেশীয় পরমাণু অস্ত্র প্রতিযোগিতার প্রেক্ষাপটে বিবেচনার দাবী রাখে। বাংলাদেশর সেনাবাহিনী আকারে ক্ষুদ্র। সিটিজেন্স আর্মী এই সনাতন সেনাবাহিনীর জন্য উপযুক্ত সম্পূরক হতে পারে।

পঞ্চমতঃ বাংলাদেশকে বর্তমানে এই বাস্তবতার আলোকে নিরাপত্তা কৌশল বিশ্লেষণ করতে হবে যে, পরমাণু শক্তির অধিকারী দুটি দেশ তার প্রতিবেশী। উপরন্তু, দুইটি বৈরী দেশ পরমাণু শক্তির অধিকারী হওয়ায় এতদঞ্চলের নিরাপত্তা হুমকির সম্মুখীন। এমতাবস্থায় দক্ষিণ এশীয় অন্যান্য পরমাণুমুক্ত দেশগুলিকে নিয়ে বাংলাদেশ ব্যাপক আকারে পরমাণু বিরোধী প্রচার কার্য চালাতে পারে জনমত গঠনের জন্য। এই প্রচার কার্যের উদ্দেশ্য হবে পরমাণু অস্ত্রের ভয়াবহতা সম্বন্ধে জনগণকে সচেতন করে তোলা। এন জি ও গুলো এই

ব্যাপারে সক্রিয় ভূমিকা পালন করতে পারে। ১৯৮৩ সনে ইউরোপে অনুষ্ঠিত শান্তি আন্দোলন থেকে দক্ষিণ এশীয় দেশগুলো শিক্ষা নিতে পারে।

ষষ্ঠতঃ বাংলাদেশ দক্ষিণ এশিয়ায় উত্তেজনা প্রশমনের লক্ষ্যে Confidence Building Measures (CBM) গ্রহণ করতে পারে। ইতোমধ্যেই ভারত ও পাকিস্থান নিজেদের মধ্যে হট লাইন স্থাপন করেছে। কিন্তু No-First-use চুক্তি এখন পর্যন্ত কোন দেশই স্বাক্ষর করেনি। সামরিক শুভেচ্ছা সফর, পাক-ভারত উভয়দেশেই সেমিনার আয়োজন, পারস্পরিকভিত্তিতে প্রশিক্ষণ কোর্সের আয়োজন, প্রচলিত অস্ত্রের মজুত কমিয়ে ফেলা প্রভৃতি ব্যবস্থা গ্রহণের ব্যাপারে বাংলাদেশ মধ্যস্থতাকারী হিসেবে কাজ করতে পারে।

সপ্তমতঃ পরবর্তী সার্ক শীর্ষ সম্মেলনে পারমাণবিক বিষয়টি উত্থাপন করা যেতে পারে। যেহেতু বিরোধপূর্ণ দ্বিপাক্ষিক কোন ইস্যু সার্ক ফোরামে আলোচিত হতে পারেনা সেহেতু আঞ্চলিক উদ্বেগের বিষয় হিসেবে পরমাণু ইস্যুটিকে আলোচনার টেবিলে আনা যেতে পারে। বাংলাদেশ এ ব্যাপারে অগ্রণী ভূমিকা রাখতে পারে।

আমরা জানি বাংলাদেশের অভ্যন্তরীণ সমস্যা নিরাপত্তার জন্য বেশী হুমকি সৃষ্টি করে থাকে। বিশেষ করে অর্থনৈতিক নিরাপত্তাহীনতা এর জন্য বেশী দায়ী। অত্যধিক জনসংখ্যা, দারিদ্র্য, অশিক্ষা, রাজনৈতিক অস্থিতিশীলতা প্রভৃতি সমস্যায় বাংলাদেশ জর্জরিত। অর্থনৈতিক উন্নয়নের নামে প্রদত্ত বৈদেশিক সাহায্য প্রকারান্তরে দেশের দারিদ্র্যকে আরো ঘনীভূত করছে। শর্তযুক্ত এই সব বৈদেশিক সাহায্যের সিংহভাগ অর্থ ফেরত যায় আবার দাতা দেশসমূহে। পরিবহন খরচ, উচ্চহারে কনসালট্যান্সী ফি ইত্যাদি নানা খাতে অর্থ ব্যয়িত হওয়ার পর দেখা যায় মোট অর্থের খুব সামান্যই অবশিষ্ট আছে উন্নয়ন খাতের জন্য। উল্লেখ্য, পরিবহন/জাহাজীকরণ, কনসালট্যান্ট নিয়োগ প্রভৃতি দাতা দেশই নির্ধারণ করে দেয়। প্রায় সবক্ষেত্রেই কনসালট্যান্ট দাতা দেশের নাগরিক হয়ে থাকেন।

আর্থিক দুর্নীতি বাংলাদেশর জন্য একটি ভয়াবহ সমস্যা। এর ফলে দেশের অগ্রগতি/উন্নয়ন চরমভাবে ব্যাহত হচ্ছে। ইউ এনডিপি প্রধান গুস্তাভ স্পেথ

সফল উন্নয়নের ক্ষেত্রে দুর্নীতিকে ক্যান্সার হিসেবে বর্ণনা করেন (সূত্র ঃ ১০ই আগষ্ট, ১৯৯৭ দৈনিক ইত্তেফাক)। দুর্নীতি দমনের জন্য দরকার সুশাসন। ইউ এন ডি পি ১৯৯৭ সনে এর গুরুত্ব অনুধাবন করে ৩ কোটি ৬০ লক্ষ ডলারের একটি তহবিল গঠন করেছে সুশাসন প্রতিষ্ঠার লক্ষ্যে।

উপসংহার

বৃহৎ প্রতিবেশী ভারত দ্বারা বেষ্টিত (India-locked) বাংলাদেশ একটি ছোট রাষ্ট্র। সুইডেনের খ্যাতনামা নিরাপত্তা বিশেষজ্ঞ এ ধরনের ভৌগোলিক অবস্থানের অধিকারী রাষ্ট্রসমূহের নিরাপত্তার সমস্যা কুশলতার সাথে বর্ণনা করেছেনঃ "The rim stateds problem is like the problem of 'Pilot fish' : how to keep close to the shark without being eaten" (মনিরুজ্জামান, ১৯৯৫)।

বাংলাদেশের জন্য কোন ধরনের নিরাপত্তা কৌশল বেশী কার্যকরী সে বিষয়ে জাতীয় ঐক্যমত অবিলম্বে গঠন করা উচিত। দেশের শীর্ষস্থানীয় আমলা, বুদ্ধিজীবী সকলকেই এ বিষয়ে অগ্রণী ভূমিকা পালন করতে হবে। সেমিনার, সিম্পোজিয়াম, বৈঠক/সংলাপ প্রভৃতি আয়োজনের মাধ্যমে এটা সম্ভব। সনাতন ও অসনাতন–নিরাপত্তার এই উভয়বিধ দৃষ্টিভঙ্গি এ ক্ষেত্রে প্রাধান্য পাবে। নচেৎ একটি সুষম নিরাপত্তা কৌশল প্রণয়ন সম্ভব হবে না। উন্নয়নের ভিত্তিতে আত্মরক্ষা এটাই হওয়া উচিত বাংলাদেশের মতো ক্ষুদ্র রাষ্ট্রের নিরাপত্তার মূল বিষয়। কেননা আক্রমণ নয় আত্মরক্ষাই হল আমাদের নিরাপত্তা ব্যবস্থার প্রধান কৌশল। জাপান, সুইজারল্যান্ড প্রভৃতি দেশকে আমরা এই প্রসঙ্গে দৃষ্টান্ত স্বরূপ উল্লেখ করতে পারি। সংবিধান মোতাবেক জাপানে মোট জি. ডি. পি-র মাত্র ১% সামরিক খাতে ব্যায়িত হয়। এর বেশী নয়। জাপানের জি. ডি. পি-র আকার বিশ্বে দ্বিতীয় বৃহত্তম। কাজেই জাপানের জি.ডি.প-র ১% হল ৩৭.৮৩ বিলিয়ন মার্কিন ডলার যা বিশ্বের অনেক দেশের সামরিক ব্যয়কে অতিক্রম করে গেছে। এই প্রবন্ধের পূর্বভাগে আমরা দেখেছি জাপান বর্তমানে পৃথিবীর দ্বিতীয় শক্তিধর দেশ। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধে পরাজিত শক্তি জাপানের এই উত্থানের পিছনে ক্রিয়াশীল ছিল জাপানী জনগণের যুদ্ধবিরোধী মনোভাব। যুদ্ধোত্তরকালে

জাপানী জনগণ দেশের অর্থনৈতিক উন্নয়নে পুরোপুরি আত্মনিয়োগ করেন। ফলে দেশে বিস্ময়কর অর্থনৈতিক উত্থান ঘটে। জাপানের এই অর্থনৈতিক সমৃদ্ধিই হলো সামরিক শক্তির ভিত্তি। বাংলাদেশের ক্ষেত্রেও একই যুক্তি প্রযোজ্য। কেননা আমাদের মনে রাখতে হবে অর্থনৈতিক শক্তিই হলো সামরিক শক্তির উৎস।

তথ্য নির্দেশিকা

Cluade Jr. Ins L. (1966) 'Preventive Diplomacy' in Lawrence W. Martin (ed.) *Diplomacy in Modern European History.* New York : The Macmillan Company.

GOB (1998) Emergency Operation Center : M/O Disaster Management and Relief.

Holst, Johan Jargon (ed.) (1973) Five Roads to Nordic Security. Oslo : Universities forlaget.

Islam, ABU Azizul (2000) South Asian Nuclear Syndrome : Implication and Policy Options for Bangladesh. *Bangladesh Army Journal.* Dhaka.

Kodikara, Selenton (1979) *Strategic Factors in Interstate Relations in South Asia.* ANU Canberra : Strategic and Defence Studies Centre.

Lippman, Walter (1943) *U. S. Foreign Policy : Shield of the Republic.* Boston : Brown & Co.

Maniruzzaman, Talukdar (1982) *The security of small states in the third world.* The Strategic and Defence Studies Centre : Australian National University.

McNamara, S Robert (1968) *The Essence of Security.* New York : Harper and Row.

Morison, Charles E. and Suhrke, Astri (1978) *Strategies of Survival : The Foreign Policy Dilemmas of Smaller Asian States.* St. Lucia : University of Queensland Press.

Pettman, Ralph (1976) *Smaller Power Politics & International Relations in South East Asia.* Sydney : Holt, Rinehart and winstion.

Rothstein, Robert L. (1968) *Alliances and Small Power.* New York : Columbia University Press.

Roberts Adam (1976) *Nations in Arms : The Theory and Proactive of Territorial Defence.* London : Chatto & Windus.

Sieves, V. V. (1970) *Small Nation Survival : Political Defence in Unequal Conflicts.* Jericho, N. Y.: Exposition Press Inc.

Scholl, August and Brundtland, Arena Olau (1971) *Small States in International Relations.* Stockholm : Almqvist & wiksell.

Singer, David J. and Small, Melvin (1966) *The Composition and Status Ordering of the International System : 1815-1940.* New York : World Politics.

UNDP (2000) *Human Development Report.* UNDP.

Vital, David (1967) *The Inequality of States : A Study of Smaller Power in International Relations.* Oxford : The Clarendon Press.

Wolferes, Arnold (1962) *Discord and Collaboration : On International Poltics.* Baltimore : The Johns Hopkins Press.

Writh, D. A. (1989) *Climate Chaos.* Foreign Policy, No. 74

দৈনিক ইত্তেফাক, ১০ আগষ্ট, ১৯৯৭।

বাংলাদেশ সরকার (২০০১) *বাংলাদেশ অর্থনৈতিক সমীক্ষা ২০০০।* ঢাকা ঃ পরিকল্পনা কমিশন।

হোসেন একরাম ও ইমাম কাজী হাসান (১৯৯৮) *বাংলাদেশের পরিবেশ ও টেকসই কৃষি সম্পদ ব্যবস্থাপনার আইনগত কাঠামো।* ঢাকা ঃ বিপিএটিসি।